নিত্যপণ্যের বাজারে থেমে নেই সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম: জীবন-জীবিকা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি

এস এম নাজের হোসাইন

প্রতিবছর পবিত্র মাহে রমজান মাস আসার অনেক আগেই নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। আর রমজানে এই নিত্যপণ্যের মূল্য সহনীয় রাখতে সরকার ও ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো প্রতিবছর নানারকম অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যে কোনো পূজা-পার্বন-ঈদ উপলক্ষে বাজারের চাবিকাঠি চলে যায় অশুভ চক্রের হাতে। নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে-এ যেন অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে। বেশকিছুদিন ধরেই লাফিয়ে লাফিয়ে, দফায় দফায় বাড়ছে নিত্যপণ্যের দাম। উৎসব, পূজা-পার্বন উপলক্ষে সব দেশেই কিছু পণ্যের চাহিদা বাড়ে। ওই পণ্যগুলো শুধু নিছক উপহারের পণ্য, নিত্যপণ্য নয়। প্রতিদিন এসমস্ত পণ্য কেনা হয় না। কেবল বিশেষ দিনেই কেনা হয়। তাই ওই পণ্যগুলোর দাম বাড়লেও সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ে না। এদিক দিয়ে আমাদের দেশ ভিন্নতর। দামি বিলাসী পণ্য নয়, সুযোগ পেলেই সবগুলো নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়। প্রতি বছরই রমজানকে সামনে রেখে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এবারও ব্যত্যয় হয়নি, রমজান আসার আগেই ইফতারি ও সেহরিকে সামনে রেখে নতুনভাবে ভোজ্যতেল সয়াবিন, পাম অয়েল, পেঁয়াজ, আটা-ময়দা ও ডালের দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা। পর্যাপ্ত মজুত, আমদানি স্বাভাবিক থাকলেও সরবরাহ লাইনে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে কিংবা নানা অজুহাতে বাড়ানো হচ্ছে চাল, চিনি, মসুর ডাল, প্যাকেট আটা ও ময়দার দাম। দাম বাড়াতে ব্যবসায়ীদের অজুহাতের শেষ নাই। আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই দিয়ে টানা ছয় মাস ধরে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। আবার এখন যোগ হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধের অজুহাত। সম্প্রতি ভোজ্যতেলের আমদানিকারক ও রিফাইনারীরা ভোজ্যতেলের দাম বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। আর তখন থেকেই বাজারে ভোজ্যতেল উধাও হয়ে যায়। পরবর্তীতে সরকারের ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মিল ও আমদানিকারক পর্যায়ে তদারকির পর বাজারে ভোজ্যতেলের প্রাপ্তি দৃশ্যমান হয়।

বৈশ্বিক করোনা মহামারীর ঢেউ সামলে স্বাভাবিক আয়ে ফিরতে লড়াই করছে সাধারণ মানুষ। কিন্তু তাদের এ লড়াই আরও কঠিন করে তুলেছে জীবনযাত্রার বাড়তি খরচ। চাল, ডাল, তেল, আটা থেকে শুরু করে সবকিছুর দাম ক্রমাগতভাবেই বেড়েই চলেছে। বাজারের উত্তাপ সইতে না পেরে মধ্যবিত্তরাও টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌঁড়াচ্ছেন। নিত্যপণ্য পেতে সেখানেও হাহাকার। ঘন্টার পর ঘন্টা দাড়িয়ে অনেকে ফিরছেন খালি হাতে। এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে নিত্যপণ্যমূল্যের অস্থিরতা সামলাতে নড়েচড়ে বসেছে সরকার। এরই মধ্যে ভোজ্যতেলসহ চিনি ও ছোলার ওপর থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রত্যাহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও সরবরাহ নিশ্চিতে আমদানিতে সর্বোচ্চ সহায়তা দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে। নিত্যপণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে এলসি (ঋণপত্র) মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভোজ্যতেলের দাম বাড়ার কারণ অনুসন্ধানে তিন সদস্যের কমিটিও করেছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের কারসাজি ঠেকাতে সারাদেশে বাজার-তদারকি জোরদার করেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। পণ্য বেচাকেনায় পাকা রসিদের ব্যবহারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাজারে নিত্যপণ্যের দামে এসবের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব চোখে পড়ছে না। নিত্যপণ্যের দামে এখনো পুড়ছে প্রান্তিক ও সীমিত আয়ের মানুষ। দীর্ঘ হচ্ছে সাধারণ, সীমিত ও প্রান্তিক আয়ের মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

রাজধানীতে বাজার দরে মাসের ব্যবধানে প্রয়োজনীয় ১৪টি পণ্যের দাম বেড়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চাল, ডাল, তেল, আটা, চিনি, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, আলু, ব্রয়লার মুরগি, ডিম, গরুর মাংস, কাঁচামরিচ ও ছোলা। চালের বাজার দীর্ঘদিন ধরেই অস্থির। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে চাল আমদানিতে শুল্কহ্রাস করা হয়। দেশে এবার আমনের রেকর্ড ফলন ও আউসের ভালো উৎপাদনের পরও মাসের ব্যবধানে বাজারে মোটা চালের দাম কেজিতে ২ টাকা এবং সরু চালের দাম

কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। মসুর ডালের দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে ১০০ থেকে ১৩০ টাকা পর্যন্ত। এক কেজি খোলা চিনি বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। মাসের ব্যবধানে কেজিতে ২৫ থেকে ৩০ টাকা বেড়ে পেঁয়াজের কেজি হয়েছিল ৬৫ টাকা। চীনা রসুনের দামও কেজিতে ১০ টাকা এবং আদা প্রকারভেদে কেজিপ্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। খোলা আটার দামও কেজিতে ২ টাকা বেড়েছে। প্রতি কেজি আলুতেও খরচ বেড়েছে ৫ থেকে ৮ টাকা। ব্রয়লার মুরগির কেজি ১৬৫ টাকা। গরুর মাংস ঠেকেছে ৬৫০ টাকায়। ডিমের দাম হালিতে ৪ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

সরকারী বিপণণ সংস্থা ট্রেড করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবও বলছে, মাসের ব্যবধানে সরু চাল ৩.১৩ শতাংশ, মোটা চাল ৪.৩৫ শতাংশ, বড় দানার মসুর ডাল ২.৫৬ শতাংশ, বোতলজাত সয়াবিন তেল ৪.৬৯ থেকে ৬.৫৮ শতাংশ পর্যন্ত, পাম সুপার ১৬.৮৫ শতাংশ হারে দাম বেড়েছে। একই সময়ে খোলা আটা ৮.৭ শতাংশ, চিনি ৩.২৭, দেশি পেঁয়াজ ১০৮, চায়না রসুন ১৪.২৯ এবং আদা ১২.৫ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত দাম বেড়েছে। ছোলার দাম এক লাফে সাড়ে ৩ শতাংশ বেড়েছে। অপরদিকে এক মাসে ব্রয়লার মুরগির দাম ৬.৯ শতাংশ ও গরুর মাংসের দাম ৫.৮৩ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া কাঁচামরিচ ৭২.৭৩ শতাংশ ও আলুর দাম ৮.৫৭ শতাংশ বেড়েছে। ফার্মের ডিমের দাম বেড়েছে ২.৭৮ শতাংশ।

ভোক্তা ও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া, সরকার কর্তৃক ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার, নিত্যপণ্য আমদানির ক্ষেত্রে এলসি (ঋণপত্র) মার্জিনের হার ন্যূনতম পর্যায়ে রাখাসহ বাজার তদারকি জোরদার করা হলেও ভোক্তারা এর সুফল পাচ্ছেন না। বাজারে বেশি মুনাফা লুটতে এখনো তৎপর মজুতদার ও সিন্ডিকেট চক্র। এর আগে অসাধু ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজ ও চাল নিয়ে বাজার অস্থির করে তুলে অল্প সময়ে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ভোজ্যতেল নিয়ে শুরু হয়েছে। দেশে পেঁয়াজ ও চালের উৎপাদন সন্তোষজনক হলেও এগুলোতে অতি মুনাফা করছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। অসাধু ব্যবসায়ীদের অপকর্ম বন্ধে সরকারের শিথিলতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা সরবরাহ সংকট ও অতিমুনাফা করে বিপুল টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন; যার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ ভোক্তারা। গোড়া থেকে সমস্যার সমাধান না করলে সরকার যতই উদ্যোগ নিক, সুফল মিলবে না।

ভোক্তা ও বাজার বিশেষজ্ঞদের মতে, সরকার ভোজ্যতেলে ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে, এটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে ভোক্তারা এ সুবিধা উপভোগ করতে পারছে কিনা, তা নিশ্চিত করতে হবে। নাকি আমদানিকারক ও রিফাইনারীরা পুরোটাই লুটে নিচ্ছেন। একইভাবে চালের রেকর্ড উৎপাদনের পরও বেশি দামে কিনতে হচ্ছে। দেশে পেঁয়াজের ভরা মৌসুমে আবাদ বাড়ছে কিন্তু দাম কমছে না। নিত্যপণ্যের আমদানি কি পরিমাণে হচ্ছে, দাম কতো, মুজত কোথায় আছে, অর্থাৎ পণ্য সরবরাহের সঠিক পরিসংখ্যানের নজরদারি দরকার। আমদানিকৃত পণ্যের পাইকারী পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত হচ্ছে না। রসিদ ছাড়াই পণ্য বেচাকেনা চলছে। বাজারসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ে ঘাটতি রয়েছে। এসবের সুযোগ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা কারসাজি করে বারবার বাড়তি মুনাফা করছেন।

এটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত, দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের বিশাল পার্থক্যই বলে দিচ্ছেন আমাদের বাজার ব্যবস্থা ভোক্তাবান্ধব নয়। উৎপাদন অথবা আমদানি পর্যায় এবং ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যমূল্যের যে বড় ব্যবধান, তা ন্যায্য ব্যবসার পরিচয় বহন করে না। সম্প্রতি কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় পর্যায়ে ১৩ টাকার সবজি রাজধানীর খুচরা বাজারে ৩৮ টাকায় বিক্রি হয়। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন নজির নেই। ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে নানা অজুহাতে পণ্যের দাম বাড়ায়। বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অজুহাতে ব্যবসায়ীরা আবার পণ্যের দাম বাড়াচ্ছেন। যদিও এ ইস্যুতে বিশ্ববাজারে খাদ্য-পণ্যের বাজারে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। তবে এখনই দেশের বাজারে তার প্রভাব সেভাবে পড়ার কথা নয়। কারণ যে সমস্ত পণ্য দেশে

মজুত তা দুই থেকে ছয় মাস আগে আমদানি করা। অথচ অনেক আগে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়িয়ে বিক্রি করা হচ্ছে।

এদিকে ভোজ্যতেলের ভ্যাট প্রত্যাহার করায় ব্যবসায়ীদের সুবিধা হলেও ভোক্তারা কতুটুক উপকৃত হবেন তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ ভ্যাট প্রত্যাহার হলেও ভোজ্যতেল বিক্রি হবে সরকারের সর্বশেষ নির্ধারিত দাম অনুযায়ী। ভ্যাট প্রত্যাহারের পর নতুন করে দাম হয়তো বাড়বে না, কিন্তু নির্ধারিত দামের চেয়ে কমবেও না। নির্ধারিত যে দাম সেটাও তো প্রান্তিক আয়ের ভোক্তাদের নাগালের বাইরে। তবে গুটিকয়েক অসাধু ব্যবসায়ীর অনৈতিক কাজের দায় পুরো ব্যবসায়ী সমাজের নেয়া সমীচীন হবে না। এজন্য ব্যবসায়ীদের আভ্যন্তরীন জবাবদিহিতা ও সেলফ কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিকেও এগিয়ে আসতে হবে।

দেশে রান্নায় সয়াবিন তেল সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও ক্রমেই এ তেল সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দফায় দফায় বাড়ছে এর দাম। তথ্য বলছে, দেশে বার্ষিক ভোজ্যতেলের চাহিদা ২০ লাখ টন। রোজায় কিছুটা বাড়লেও বাকি মাসে এর চাহিদা ১ লাখ ৩০ হাজার টন। বিপরীতে রিফাইনারিগুলোর বার্ষিক সক্ষমতা রয়েছে ৫০ লাখ টন। অথচ সরবরাহ সংকটের অজুহাতে বাড়তি দামে কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে ভোক্তাকে। ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সম্প্রতি কারসাজি করে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ভোজ্যতেলের বাজার থেকে প্রায় হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। একই সঙ্গে তিনি এ অপকর্মের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন কঠোর হুঁশিয়ারি। শুধু সাবধান বাণী উচ্চারণ যথেষ্ট নয়। দায়ীদের চিহ্নিতকরণপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

এদিকে ভোজ্যতেল আমদানিকারক ও রিফাইনারদের সাথে বৈঠকে সয়াবিন তেলের দাম লিটার প্রতি ৮ টাকা কমানোর ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বেশিরভাগ দোকানেই সেই দাম কার্যকর হয়নি। কারণ ব্যবসায়ীদের দাবি তারা বেশী দামে কিনেছেন। পরবর্তী লট এলেই দাম কমানো সম্ভব। এখাতের ব্যবসায়ীরা বলছেন, সরকারের হুশিয়ারির পরও বাজারে তেলের মজুদ নিয়ে কারসাজি থেমে নেই। এখনো কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। তেলের পাইকাররা বলছেন, ভ্যাট কমানো হলেও শিগগিরই বাজারে এর প্রভাব পড়বে না, সময় লাগবে। কারণ তেল এরই মধ্যে বন্দর থেকে খালাস হয়ে গেছে। যে তেল বাজারে চলে এসেছে, সেগুলো আগে ফুরাতে হবে।

অর্থনীতিবিদের মতে বাজার তদারকিতে বড় ত্রুটি থাকায় নিত্যপণ্যের বাজার দিনদিন অস্থির হয়ে উঠছে। তাঁদের মতে, বাজার মনিটরিং মানেই ভ্রাম্যমাণ আদালত ও জরিমানা করাই বুঝি। তাঁরা এটাকে মনিটরিং বলতে নারাজ। এ প্রক্রিয়ায় কেবল কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ীর ক্ষতি হয় মাত্র। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে এর কোনো সুফল নেই। মনিটরিং হচ্ছে পণ্যের চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নজরদারি। আমাদের কাছে এ নিয়ে কোনো সঠিক পরিসংখ্যানই নেই। তা হলে সমাধান হবে কী করে? তাই আগে সরকারের কাছে এসব তথ্য থাকতে হবে।' প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম সাধারণ ক্রেতার নাগালে রাখতে সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে মজুদকৃত পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ভোক্তা অধিকারসহ বাজারসংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলোকে আরও কার্যকর করা ও সমন্বয় বাড়ানো দরকার।

বাজারব্যবস্থার স্বাভাবিক গতি যোগসাজশের মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত করা হলে অবশ্যই ভোক্তাস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে; যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ভোক্তা ও বাজার বিশ্লেষকদের মতে সরকার ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিত্যপণ্যের বাজারের দায়িত্ব পুরোটাই ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। সরকারের এ

ব্যবসায়ী তোষণনীতির কারণে ব্যবসায়ীরা সন্তুষ্ট হলেও সাধারণ মানুষের মুখে হাসি নেই। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর্যায়ে থাকলে কভিডকালে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যে কমেছে, তা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। গত কয়েক বছরে সরকারের পদক্ষেপ সত্ত্বেও নিত্যপণ্যের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি কেন থামানো যায়নি, তা খতিয়ে দেখা উচিত। সেকারণে ঢাকা শহরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪টি টিমের বাজার তদারকি করার কথা থাকলেও বাজারে ভোক্তারা এই টিমের দেখা পান না। জেলা শহরে জেলা প্রশাসনের বাজার তদারকি টিম মাঠে থাকার কথা থাকলেও অনেকেই ফটো সেশনের মতো বাজার তদারকি করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন দিলেও এই তদারকি কোন প্রভাব ফেলতে পারছে না। উদার বাণিজ্য নীতির সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী বা প্রতিষ্ঠান বাজারের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করার অপচেষ্টা করছে। ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে মুনাফা করতেই হবে। কিন্তু মুনাফা অর্জনের নামে তিন থেকে চারগুণ পর্যন্ত অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়।

এ অবস্থায় আমদানি, পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজার তদারকি বাড়ানো; বিকল্প ব্যবস্থাপনায় চাল, ভোজ্যতেল, আটা, চিনি, পেঁয়াজসহ নিত্যপণ্য প্রান্তিক, শ্রমজীবি ও সীমিত আয়ের মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরী; প্রয়োজনে প্রান্তিক ও শ্রমজীবিদের জন্য রেশনিং কার্ড প্রবর্তন করা যেতে পারে। বিশেষ করে করোনাকালে যাদের আয় কমে গেছে, তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচির আওতা বাড়াতে হবে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের প্রান্তিক ও শ্রমজীবি মানুষ যাতে খেয়ে-পরে বাঁচতে পারে, সেজন্য নিত্যপণ্যের দাম যেমন স্থিতিশীল রাখতে হবে, তেমনি তাদের আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির ওপর জোর দিতে হবে। আমদানিকারক, উৎপাদক, পরিবেশক, সরবরাহকারী, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী পর্যায়ে সমন্বিত বাজার (ভোক্তা ও গণমাধ্যম প্রতিনিধি সমন্বয়ে) তদারকি নিশ্চিতকরণসহ কার্যকর টিসিবি, সর্বোপরি ট্যারিফ কমিশন, কৃষি, খাদ্য, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রাজস্ব বোর্ডের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। সব পর্যায়ে ভোক্তা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণীতে ভোক্তাদের অংশগ্রহণ ও মতামতের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ব্যবসায়ীদের কুটকৌশল রোধে ভোক্তা অধিকার শিক্ষাকে জোরদার করতে হবে। এছাড়াও আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ন্যায্যমূল্যের দোকান প্রান্তিক ও সীমিত আয়ের মানুষসহ মধ্যম আয়ের মানুষের কাছে ভরসার স্থলে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশেও প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় ন্যায্য মূল্যের দোকানই অন্যতম বিকল্প হতে পারে। ন্যায্য মূল্যের দোকানের মডেল বর্তমান নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্য থামানো ও দুর্বিষহ দুরাবস্থা থেকে জাতিকে রেহাই দিতে পারে। আসন্ন রমজানে নিত্যপণ্যসহ সব ধরনের পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

© এস এম নাজের হোসাইন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)।
ই-মেইলঃ cabbd.nazer@gmail.com